আধুনিকতা, নারীমুক্তি ও নির্মীয়মান সমাজবিপ্লব

শিবনারায়ণ রায়

আমেরিকার স্বাধীনতাসংগ্রাম এবং ফরাসি বিপ্লব এই দুই নাটকীয় ঘটনার ভিতর দিয়ে ইতিহাসের যে নতুন পর্ব শুরু হয় টমাস পেইন (১৭৩৭-১৮০৯) ছিলেন তার অন্যতম বিশিষ্ট চরিত্র এবং মুখ্য প্রবক্তা। স্বাধীনতা সাম্য এবং মৈত্রীর আদর্শ তাঁর জীবনকে উদ্দীপিত করেছিল; মানবীয় অধিকারাবলির প্রতিষ্ঠা এবং সংরক্ষণের সংগ্রামে তাঁর সমুদয় শক্তিসামর্থ্য উৎসর্গিত হয়। তাঁর 'রাইটস্ অব্ ম্যান' (প্রথম খণ্ড ১৭৯১; দ্বিতীয় খণ্ড ১৭৯২) এবং 'দ্য এইজ অব্ রীজন্' (প্রথম খণ্ড ১৭৯৩; দ্বিতীয় খণ্ড ১৭৯৬) প্রকাশ মাত্রই তুমুল আলোড়ন তোলে; সঙ্গত কারণেই বই দুটি র‍্যাডিকালদের দ্বারা বীজগ্রন্থরূপে পরিগণিত হয়। কিছুকালের মধ্যেই পেইনের ভাবনার ঢেউ এসে লাগে সাগর পেরিয়ে কলকাতার ছাত্র মহলে। 'ক্যালকাটা ক্রিস্টিয়ান অবসার্ভার'-এর অগাস্ট ১৮৩২-এর খবর থেকে জানা যায় হিন্দু কলেজের ছাত্ররা আট টাকা দাম দিয়েও 'দ্য এইজ অব্ রীজন্'-এর কপি খরিদ করছেন।

প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হয় যুগান্তরের বার্তাবাহী আর একটি মহাশক্তিধর বীজগ্রন্থ; কিন্তু শুধু এ-দেশে নয়, খোদ পশ্চিমেও সেটির বৈপ্লবিক নিহিতার্থে সাড়া দিতে শিক্ষিত সমাজের সার্ধ শতাব্দীর বেশি সময় লেগে যায়। মেরি ওয়লস্টোনক্র্যাফ্ট্ (১৭৫৯-৯৭) তাঁর এ ভিন্ডিকেশ্যন অব্ দ্য রাইটস্ অব্ উ্যম্যান' লেখেন ১৭৯১ সালে; তার প্রথম এবং সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৭৯২ সালে। তার এক বছর আগে ফরাসি বিপ্লবের সমর্থনে এবং বর্কের সমালোচনার উত্তরে মেরির পুস্তিকা 'এ ভিন্ডিকেশ্যন অব্ দ্য রাইটস্ অব্ মেন' (১৭৯০) প্রকাশিত হয়েছিল। যে সমাজে এবং রাষ্ট্রব্যবস্থায় দরিদ্র এবং শোষিত জনসাধারণের মৌল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তার উচ্ছেদ ঘটানোর নৈতিক দায় জনসাধারণের, এবং ফরাসি দেশে বিপ্লবের ভিতর দিয়ে তা ঘটছে বলেই ফরাসি বিপ্লব বিবেকবান ব্যক্তিমাত্রের সমর্থন দাবি করে—এটিই ছিল ঐ পুস্তিকায় মেরির মূল বক্তব্য। কিন্তু সব সভ্য সমাজে এবং রাষ্ট্রে বঞ্চিত ও শোষিত প্রজাপুঞ্জের ভিতরে নিঃসন্দেহে যাঁরা সংখ্যাগুরু অর্থাৎ নারীজাতি, তাঁদের মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি স্বতন্ত্রভাবে পূর্বে উচ্চারিত হয়নি। এটিই মেরির প্রোজ্জ্বল ঐতিহাসিক ভূমিকা। দু'শ বছরেরও সামান্য আগে লেখা মেরির অসামান্য বই ভিন্ডিকেশ্যন পড়ে এখন যাঁরা নারী নর সাম্য এবং নারীমুক্তির অকুণ্ঠ সমর্থক তাঁরাও চমৎকৃত এবং অনুপ্রেরিত বোধ করবেন। শিল্পবিপ্লব, নগরায়ণ এবং আধুনিক শিক্ষার প্রসারের ফলে পৃথিবীর কিছু কিছু অংশে এবং সমাজের কোনও কোনও স্তরে নারীদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটেছে বটে, কিন্তু সমগ্রভাবে বিশ্ব-পরিস্থিতির দিকে চাইলেই ধরা পড়ে অধিকাংশ দেশে এবং সমাজের বিভিন্ন প্রধান স্তরে নারীরা এখনও পর্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক, পুরুষদের তুলনায় বেশি শোষিত এবং বঞ্চিত। এবং মেরির বীজগ্রন্থটিতে নারীর অধিকার বিষয়ে তিনি গভীর আবেগ এবং কিছুটা বিক্ষিপ্ত যুক্তি সহকারে যে বক্তব্য পেশ করেছিলেন

তার সত্যতা এবং প্রাসঙ্গিকতা আজও কমেনি। মেরি-সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণের মূলানুগ সম্পূর্ণ পাঠ পেলিক্যান সংস্করণে পাওয়া যায়। দীর্ঘ ভূমিকা সমেত এটি খুবই যত্নে এবং যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদনা করেছেন মিরিয়্যাম ব্রডি ক্র্যামিক।

গরিবঘরের মেয়ে মেরি সারা জীবন শুধু দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করেননি, নিজের পরিবারে এবং সমাজে পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের অবস্থা যে কতটা হীন, নিরন্তর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই তা তাঁর জানা ছিল। বাবা এডওয়ার্ড একই সঙ্গে জুলুমবাজ আর বাউন্ডুলে। তার রোজগার যৎসামান্য—তাও নিতান্ত অনিশ্চিত। বউকে মারধোর করতে বাধত না, এদিকে ছেলে মেয়ে অন্যদিকে সংসার চালানোর দায়িত্ব অনেকটাই তার উপরে। অল্পবয়স থেকেই মেরিকে রুজি রোজগারের জন্য নানা রকমের কাজ করতে হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে স্কুল কলেজে বা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ভাবে লেখাপড়া শেখবার সুযোগ মেলে নি, কিন্তু কিশোর কাল থেকেই চেতনায় ছিল যেমন স্বাধীনতার তেমনিই জ্ঞানের প্রবল ক্ষুধা। ইংরেজিতে অটোডিড্যাক্ট্ (autodidact) বলে একটা শব্দ আছে, অর্থ স্বশিক্ষিত। মেরি অদম্য আগ্রহে এবং অক্লান্ত অধ্যবসায়ে আপনাকে শিক্ষিত করে তোলেন। (এদেশে এই ধরনের স্বশিক্ষিত স্ত্রী পুরুষ আজকাল কচিৎ দেখা যায় কিন্তু আমেরিকাতে কিছুকাল আগেও বন্ধুত্ব হয়েছে এমন খালাসীর সঙ্গে যাঁর ছোট বাসগৃহে দেখেছি তাকের পর তাক ভর্তি দর্শনের বই—প্লেটো থেকে স্পিনোজা, নীট্‌শে থেকে রাসেল; অস্ট্রেলিয়াতে সপ্তাহান্ত কাটিয়েছি যুবক চাষী বন্ধুর সঙ্গে যাঁর স্ত্রীর বৃদ্ধ পিতার ব্যক্তিগত সংগ্রহে বিরাজ করছেন সফক্লেস থেকে বানার্ড শ—কোনো পরীক্ষা পাসের উদ্বেগ এবং অসম্মান যাঁদের সইতে হয় নি।) উনিশ বছর বয়সে মেরি ঘর ছাড়েন; কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে মিলে মেয়েদের একটি স্কুল চালাবার চেষ্টা করেন। আর্থিক স্বনির্ভরতার জন্য নানা রকম অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যাওয়ার পর শেষ পর্যন্ত বেছে নেন লেখাকেই পেশা হিসেবে। লেখেন মেয়েদের শিক্ষা বিষয়ে কেতাব, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে উপন্যাস, পত্রিকার জন্য সমালোচনা এবং অনুবাদ। সে যুগে কোনো মেয়ের পক্ষে লেখাকে রুজিরোজগারের একমাত্র উপায় হিসেবে অবলম্বন করা ছিল প্রায় অকল্পনীয়। অধিকাংশ পুরুষ লেখককেও তখনো পর্যন্ত জীবিকার জন্য অন্য কোনো সূত্রের উপর নির্ভর করতে হ'ত।

লেখার সূত্রে এবং মুক্তবুদ্ধি প্রকাশক জনসনের সহায়তায় তৎকালীন র‍্যাডিক্যাল ভাবুক, শিল্পী, কবিদের সঙ্গে (গডউইন, পেইন, প্রিস্ট্‌লি, কবি চিত্রকর ব্লেইক, শিল্পী ফুসেলি ইত্যাদি) মেরির বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। দুর্জয় তাঁর সাহস, যুগান্তপ্রসারী তাঁর কল্পনা, স্ত্রী পুরুষের বিকাশ-সম্ভাবনায় অধৃষ্য তাঁর আস্থা, সব রকম অন্যায় এবং প্রতিষ্ঠিত শোষণ-শাসন ব্যবস্থার উচ্ছেদে নিয়োজিত তাঁর লেখনী এবং শক্তি সামর্থ্য। তাঁর নিজের রচনাবলি এবং চিঠিপত্র, উইলিয়াম গডউইনের স্মৃতিচারণ, এড্‌না, নিক্সন অথবা এলীনর ফ্লেক্সনার রচিত তাঁর জীবনী থেকে তাঁর যে বহ্নিপ্রভ রূপটি আমার মনে আকার নেয়, ওপির আঁকা প্রতিকৃতিতে সেটি সঠিক ধরা পড়েনি—তেজের চাইতে সে ছবিতে স্পষ্টতর তাঁর রূপলাবণ্য, তাঁর দৃষ্টির স্বপ্নময়তা ও করুণা। তাঁর ভিন্‌ডিকেশ্যন প্রকাশিত হওয়ার পর বিদগ্ধ হোরেস ওয়ালপোল তাঁর বর্ণনা দেন

'পেটিকোট পরা হায়না' বলে তাঁর যুক্তি খণ্ডন করতে কেউ এগিয়ে আসেননি, কিন্তু অনেকেই চেষ্টা করেছেন তাঁর নাম কুৎসা-কলঙ্কিত করতে। আজকের দিনেও অন্তত এই উপমহাদেশে, বিত্তপ্রতিপত্তিহীন কোনো যুবতী যদি স্বাধীন এবং স্বনির্ভর হয়ে থাকার চেষ্টা করেন, তাঁর ভাবনাচিন্তা বিশ্বাসকে স্পষ্টভাষায় রূপ দেন, অথবা তাঁর মুক্তবুদ্ধির নির্দেশ অনুযায়ী বাঁচতে চান, তিনিও কুৎসা কলঙ্ক পৈশুন্যের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবেন না। তার উপরে মেরি নির্দ্বিধায় স্বাগত করেছিলেন ঘোর রক্ষণশীল তৃতীয় জর্জের ইংল্যান্ডে বসে ফ্রান্সের মহাবিপ্লবকে। কলম ধরেছিলেন সে যুগের ব্যাপক প্রভাবশালী বাগ্মী ও মনীষী এডমন্ড বর্কের বিরুদ্ধে। ১৭৮৯ সালের ১৪ই জুলাই কুখ্যাত বাস্তিল-কারাগার দুর্গের পতন, আগস্ট মাসে মানবীয় ও নাগরিক অধিকারাবলীর ঘোষণা, পরের বছর আইন করে চার্চকে সরকারের অধীন করা, ১৭৯১ সালের নতুন সংবিধান এবং ১৭৯২ সালে রাজতন্ত্র বিলোপ করে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা—এই নাটকীয় ঘটনাক্রমের ভিতরে মেরি দেখেছিলেন প্রচলিত অসাম্যভিত্তিক প্রাচীন ব্যবস্থার অবসান এবং স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শে প্রাণিত নবসভ্যতার অভ্যুদয়। ১৭৯২ সালে মেরি নিজে যান ফ্রান্সে। সেখানে বিপ্লবের সময়ে যেসব র‍্যাডিক্যাল ভাবুক পারি শহরে জমায়েত হয়েছিলেন তাঁরা তাঁকে স্বাগত করেছেন, ফরাসি তর্জমায় ভিন্‌ডিকেশ্যনের তৎকালে ইয়োরোপে তারিফ মিলেছে। তবে বিপ্লবের কাছে মেরি যে আশা করেছিলেন তা ঘটেনি ফ্রান্সে। সম্ভবত কোনো রাষ্ট্রবিপ্লবই পরিপূর্ণ-সার্থকতা অর্জন করতে পারে না। বিপ্লবের ভিতর দিয়ে যে ধ্বংসপ্রবণ শক্তি প্রবল হয় তার চাপে বিপ্লবের পিছনে যে সব আদর্শ সক্রিয় তারা অনেকটাই চাপা পড়ে যায়। জনসাধারণের উপরে মেরির আস্থা শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল। কিন্তু নেতাদের ক্রিয়াকলাপ কী ভাবে বিপ্লবের আদর্শকে বিকৃত করে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই তার কিছুটা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ক্ষমতার অধিকার নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ক্ষমতার কেন্দ্রায়ন, কমিটি অব পাবলিক সেফ্‌টি এবং রেভিলিউশ্যনারি ট্রাইবুনালের বিবেচনাহীন দমননীতি, থার্মিডরীয় প্রতিক্রিয়া এবং শেষে ডিক্টেটরির শাসন—এই ঘটনাক্রমের সবটা তিনি দেখেন নি। তবে তাঁকেও বিপ্লবী ফ্রান্সে কিছুদিনের জন্য টম পেইনের মতো কারারুদ্ধ হয়ে কাটাতে হয়। বিপ্লবের অসংখ্য বলির মধ্যে ছিলেন "স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী"র মত দুই মুখ্য নেত্রী—মাদাম রঁলা এবং মাদাম এব্যার। কিন্তু মেরি একদা বর্ককে যে কথা লিখেছিলেন—"ফ্রান্সের অবস্থায় থাকলে তুমিও বিপ্লবী হতে"—সে কথা শেষ পর্যন্ত ভোলেননি। ১৭৯৪ সালে মেরি লেখেন 'হিস্টরিক্যাল অ্যাণ্ড মর‍্যাল ভিউ অব্ দ্য অরিজিন অ্যাণ্ড প্রগ্রেস অব্ দ্য ফ্রেঞ্চ রেভেলিউশ্যন।'

কিন্তু মেরি ওয়লস্টোনক্র্যাফ্‌ট্ জীবনে সুখ, শান্তি স্বাচ্ছল্য বা সামাজিক প্রতিষ্ঠা পান নি। কোনো বিশেষ পুরুষের প্রতি আসক্ত হওয়া যে নারীর স্বাধীনতা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে একটি প্রধান বাধা, এটি তিনি জানতেন, এবং ভিন্‌ডিকেশ্যন-এ সে বিষয়ে স্পষ্ট করেই লিখেছিলেন। তবু প্রেমের দুর্মর শক্তিকে সেই স্বাধীনতা ঠেকাতে পারেন নি।; আর গিলবার্ট ইমলে নামে যে লোকটিকে তিনি ভালো বাসলেন সে ছিল একেবারেই নির্বিবেক, চতুর, প্রেমব্যবসায়ী। মেরি তাকে গভীরভাবেই ভালোবেসেছিলেন—স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে লেখা চিঠিগুলি

এখনো পাঠকহৃদয় আলোড়িত করে—এবং ইমলের ল্যাম্পট্য এবং দুর্ব্যবহার সহ্য করতে না পেরে তিনি আত্মহত্যা করতে যান। সৌভাগ্যক্রমে সে চেষ্টা সফল হয়নি; বন্ধু র‍্যাডিক্যাল নৈরাজ্যবাদী দার্শনিক উইলিয়ম গডউইনের সঙ্গে তাঁর প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দুজনেই নীতিগতভাবে বিবাহের বিরোধী। কিন্তু মেরি গর্ভবতী হবার পর সন্তানের কথা বিবেচনা করে তাঁরা অনিচ্ছায় হলেও অনুষ্ঠান (মার্চ, ১৯৭৭) মেনে নেন। তবে বিয়ে করলেও তাঁরা পরস্পরের ব্যক্তিত্ব এবং স্বাতন্ত্র্যকে সম্মান করতেন; গর্ভবতী অবস্থাতেই মেরি নতুন একটি উপন্যাস এবং একটি প্রবন্ধ গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। তাঁর 'রংস অব্ উইমিন' মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। গডউইন নিজের লেখাপড়ার জন্য স্বতন্ত্র একটি গৃহের ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন। আমাদের সময়ে সিমোন দ্য বোভোয়ার এবং জাঁ পল সার্ত্রকেও এইভাবে স্বাতন্ত্র্য এবং বন্ধুতা বজায় রাখতে দেখি।

লেখা অসমাপ্ত রেখে অসুস্থ অবস্থায় সন্তান প্রসবের পরই মেরি মারা যান (আগস্ট, ১৭৯৭); তখন তাঁর বয়স মাত্র আটত্রিশ। পরবর্তীকালে এই সন্তানই হন বিপ্লবী কবি শেলীর স্ত্রী মেরি, লেখেন বিখ্যাত কাহিনী ফ্রাঙ্কেনস্টাইন। মেরি ওয়ালস্টোনক্র্যাফ্ট্রের মৃত্যুর পরের বছর গডউইন মেরির অপ্রকাশিত রচনাবলি সম্পাদনা করে চার খণ্ডে প্রকাশ করেন। মেরি সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিচারণও একই সঙ্গে পুস্তককারে প্রকাশিত হয়। কিন্তু পুরুষশাসিত সমাজে কোনও নারী ভাবুকের স্বীকৃতি মেলা সে সময়ে এখনকার চাইতেও অনেক বেশী কঠিন ছিল; তা ছাড়া ভিনডিকশ্যনে নারী-নর সাম্যের এবং নারীর অধিকারাবলির প্রতিষ্ঠার যে দাবি প্রবল স্পষ্টতায় ঘোষিত হয় তা ছিল তখনকার সমাজসংস্কৃতির পরিবেশে খুবই বৈপ্লবিক। মেরি চেয়েছিলেন নারী এবং পুরুষ উভয়ের মধ্যেই যথার্থ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ও বিকাশ, এবং তার জন্য এক দিকে যেমন শিক্ষার ক্ষেত্রে, অন্য দিকে তেমনই রাষ্ট্রিক আর্থিক সামাজিক ব্যবস্থায় আমূল রূপান্তর তাঁর কাছে সঙ্গত কারণেই জরুরি ঠেকেছিল।

'ভিন্ডিকেশ্যন'-এর উৎসর্গে মেরি লিখেছিলেন, স্বাধীনতা তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মেয়েরা জীবনে স্বাধীনতাকে সব চাইতে মূল্য দিতে শিখুক, এটাই ছিল তাঁর কাম্য। সমাজে ও পরিবারে মেয়েদের ভূমিকা, নারী-পুরুষের মধ্যে নির্দিষ্ট সম্পর্ক, মেয়েদের "নারীত্ব" (সেবা, মাতৃত্ব, লাবণ্য ইত্যাদি) এবং ছেলেদের "পৌরুষ" (কর্তৃত্বপরায়ণতা, বলশালিতা ইত্যাদি)—এ সব সম্পর্কে ধর্মগ্রন্থ, নীতিশাস্ত্র, লোকাচার এবং আইনকানুনের মাধ্যমে যে সব ধারণা এবং আচরণ পরম্পরাক্রমে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত সেগুলি যে প্রকৃতপক্ষে একেবারেই মনুষ্যত্ববিরোধী, বিচার বিশ্লেষণ করে, স্ত্রী পুরুষের শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন জানিয়ে, তা তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন। পুরুষশাসিত সমাজ-সংস্কৃতি নারীকে নির্বোধ, প্রশ্নবিমুখ, পরনির্ভর, দুর্বল আত্মমর্যাদাবোধহীন করে রেখে শুধু মেয়েদের নয়, সমগ্রভাবে মনুষ্যসমাজের অশেষ ক্ষতি করেছে—এ সম্পর্কে তাঁর মনে সংশয় ছিল না। বিবাহ নয়, স্ত্রীপুরুষে সমান সমান হিসেবে বন্ধুতা; প্রতিদানহীন সেবার ভিতর দিয়ে আত্মবিলোপ নয়, স্বমর্যাদার চেতনায় অনুশীলনের ভিতর দিয়ে আত্মবিকাশ এবং ও সমাজে পরিবারে প্রকৃত আত্মপ্রতিষ্ঠা; আর্থিক স্বাধীনতা ও স্বনির্ভরতা—মেরি তাঁর

পাঠিকাদের এই সাধনায় আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলেন। আর এই সব কারণেই বিশ শতকের শেষে ভিনডিকেশান আবার পড়ে নির্দ্বিধায় বলতে পারি নারীমুক্তির এটিই প্রথম পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক ইস্তাহার, এবং কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর চাইতে এটির তাৎপর্য বেশি বই কম নয়।

স্বভাবতই এই ধরনের বৈপ্লবিক চিন্তা উনিশ শতকের স্ত্রী পুরুষের মনে সাড়া তোলেনি। যাঁরা সংস্কাররূপে দেখা দিয়েছিলেন তাঁরাও মেরির র‍্যাডিক্যাল চিন্তা গ্রহণ করেননি।

নারীদের ভোটাধিকার আন্দোলনের নেত্রী মিলিসেপ্ট ফসেট ১৮৯১ সালে ভিনডিকেশ্যনের যে সংস্করণটি প্রকাশ করেন তাতেও মেরির জীবন ও চিন্তা সম্পর্কে মিলিসেপ্টের সঙ্কোচ অপ্রত্যক্ষ নয়। বস্তুত বীজগ্রন্থরূপে পরিগণিত হবার জন্য ভিনডিকেশ্যন-কে শতাব্দীর বেশি কাল অপেক্ষা করতে হয়েছে। নৈরাজ্যবাদী এমা গোল্ডম্যান দীর্ঘকালের অবহেলিত মেরিকে স্বাগত করেন 'আধুনিক নারীত্বের প্রথম প্রবক্তা' (১৯১৭) বলে। আমাদের কালে তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়েছেন নারীমুক্তি আন্দোলনের নেত্রী স্থানীয়দের ভিতরে অনেকে। 'নারীর পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের কথা মেরি-ই প্রথম ঘোষণা করেন,' লিখেছেন কেইট মিলেট (সেক্সুয়াল পলিটিক্স), জারমেইন গ্রিয়ার (দ্য ফিমেল ইউনাক)। বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষেও সম্প্রতিককালে মেরিকে নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। সমকালে মেরির মশালকে প্রজ্জ্বলিত করে তুলেছেন বাংলাদেশে নির্ভীক নারীবাদী তসলিমা নাসরিন। বিশ শতকের শেষে একুশ শতকের সূচনায় বিশ্বব্যাপী যে সমাজবিপ্লব আমার কাছে প্রায় অনিবার্য ঠেকে তার একটি দিকের ভাবরূপ দেখতে পাই তসলিমার রচনায়।

দুই.

মেরির প্রতিপাদনে যে আধুনিকতার প্রবল প্রকাশ তা ইয়োরোপে সূচিত হয়েছিল রেনেসাঁসের ভিতর দিয়ে। সতেরো এবং আঠারো শতকে "আলোকসম্পাত" বা এনলাইটানমেন্ট আন্দোলনের ভিতর দিয়ে সেই আধুনিক ধ্যানধারণা পশ্চিম ইয়োরোপে ছড়িয়ে যায়, প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা বা বিশ্বাসাদির সঙ্গে লড়াই করে সেখানকার সমাজ-সংস্কৃতিতে তার অনেকটাই প্রতিষ্ঠা ঘটে।

এ ব্যাপারে মস্ত ভূমিকা ছিল "র‍্যাডিক্যাল" ভাবুকদের যুক্তিবাদী এবং অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের, প্রবল পরাক্রান্ত চার্চ প্রতিষ্ঠান ও স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র এবং অভিজাততন্ত্রের বিরুদ্ধে যাঁরা সংগ্রাম করেছিলেন সেই বিবেকনিষ্ঠ ব্যক্তিদের। পশ্চিমে আধুনিকতাকে 'বিজয়ী' করে আমেরিকায় সার্বভৌম সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, ফরাসী বিপ্লব ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লব। ব্যক্তিকতার চেতনা, মানুষকে ইতিহাস রচয়িতারূপে দেখা, স্বাধীনতাকে নৈতিক জীবনের কেন্দ্রে স্থাপনা, নির্ভরযোগ্য জ্ঞানের জন্য ধর্মগ্রন্থের চাইতে বিজ্ঞানচর্চাকে বেশি মূল্য দেওয়া, বিজ্ঞানের প্রাযুক্তিক প্রয়োগের দ্বারা সম্পদবর্ধনের উদ্যোগ, মানবিক অধিকার বলির স্বীকৃতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও সমাজগঠনের নায্যতা ও কাম্যতা,—আধুনিকতার এই সব ধ্যানধারণার পশ্চিম ইয়োরোপে পরিস্ফুট হয়ে ব্যবসাবাণিজ্য ও সাম্রাজ্যবিস্তারের সূত্রে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে।

এ-দেশে আধুনিকতা আসে ইংরেজ শাসন আর ইংরেজি ভাষার সূত্রে, এবং যদিও তার ভাবগত প্রভাব মুষ্টিমেয় ভারতীয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, সেই আধুনিকতার ভারতীয় বিভিন্ন ভাষাধৃত প্রকাশ তার প্রভাবের সম্ভাবনাকে বেশ কিছুটা বাড়িয়ে দেয়। বস্তুত বিদেশাগত আধুনিকতার অন্যতম প্রধান এবং স্থায়ী সুফল হল নতুন ভাবনার ধাক্কায় নব্য ভারতীয় ভাষাগুলির, বিশেষ করে তাদের গদ্যসাহিত্যের, লক্ষ্যণীয় শ্রীবৃদ্ধি। ইংরেজি ভাষায় দখল আসার ফলে যাঁরা আধুনিক দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য ইতিহাস সমাজতত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছিলেন তাঁদের ভিতরে অনেকের মনে নতুন সেই সব ভাবনাকে আপন আপন মাতৃভাষায় প্রকাশ করবার তাগিদ ক্রমে প্রবল হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এটি খুবই স্পষ্ট। বিদেশি শাসনের বিস্তর অপকীর্তির কথা আমরা জানি; কিন্তু ইংরেজি ভাষার সূত্রে আধুনিক পশ্চিমের ভাবনাচিন্তা এবং সাহিত্য যে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের বিকাশে সহায়ক হয়েছিল, নিতান্ত সংকীর্ণবুদ্ধি স্বাজাত্যভিমানী ছাড়া আর কারও পক্ষে সে কথা অস্বীকার করা সম্ভব হয়।

কিন্তু এ-দেশে উনিশ শতকে ইংরেজি এবং আধুনিক শিক্ষা মুষ্টিমেয় বিত্তবান নগরবাসীর ভিতরেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁরা এসেছিলেন পরম্পরাশ্রয়ী হিন্দুসমাজে যাদের উঁচু জাতি বলা হয়, মুখ্যত তাদের ভিতর থেকে—প্রধানত বামুন-কায়েত-বদ্যিরা ইংরেজি শিখে নতুন ব্যবস্থায় নিজেদের প্রতিপত্তিকে আরও দৃঢ়মূল করলেন। তাঁদের ভিতরে কিছু পুরুষ নতুন ধ্যানধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজ-সংস্কারে, ধর্ম-সংস্কারে, ভাষা-সংস্কারে, শিক্ষা-সংস্কারে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু মেয়েরা রয়ে গেলেন অন্তঃপুরের অন্ধকারে। শিক্ষার অভাবে নতুন ভাবনা চিন্তা তাঁদের চেতনায় গতি সঞ্চার করল না। শাস্ত্র এবং লোকাচারশাসিত সমাজ যে বহু শতাব্দী ধরে নানাভাবে তাঁদের বঞ্চিত করে রেখেছে, পরিবার এবং সমাজে তাঁরা যে সর্বব্যাপী অসাম্যের প্রধান বলি, এই বোধ হয়তো তাঁদের মধ্যে কিছু নারীকে পীড়া দিয়েছে—ছড়ায়, প্রবাদে, লোকগীতিতে তার কিছু কিছু প্রকাশ চোখে পড়ে—কিন্তু এই অবস্থা যে আদৌ বদলানো সম্ভব, এমন কি অন্যায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য প্রতিবাদ যে সঙ্গত—এ বোধ তাঁদের ভিতরে দেখা যায়নি।

আধুনিক চেতনায় যে পুরুষরা উদ্বুদ্ধ হচ্ছিলেন তাঁদের ভিতরে অনেকে নারীদের অবস্থার উন্নতি চাইলেন। পুরুষের ভোগে লাগা এবং তাদের সেবা করা, সন্তানের জন্ম দেওয়া এবং তার লালন-পালন করার, আর এভাবেই জীবন কাটানো নারীর ধর্ম—পূর্ববর্তীদের এটা ছিল দৃঢ় বিশ্বাস। প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় পুরুষরচিত সাহিত্যে এর প্রতিবাদ দুর্লভ। নগরবাসী যেসব পুরুষ বিদেশীদের শাসন এবং ইংরেজি ভাষার সূত্রে আধুনিক ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তাঁদের ভিতরে কেউ কেউ অনুভব করলেন যে, আমাদের পরম্পরাশ্রয়ী সমাজে মেয়েদের যে দুরবস্থা তার জন্য পুরুষরাই দায়ী, মেয়েদের উপরে চাপানো বিশেষ বিধিনিষেধগুলি অধিকাংশই ন্যায়সঙ্গত নয়, এবং এই অসাম্যভিত্তিক সমাজব্যবস্থার রূপান্তর দরকার। তাঁদের পূর্ববর্তীরা এই অন্যায় সম্পর্কে আদৌ সচেতন ছিলেন না, ফলে এ বিষয়ে তাঁদের কোন গ্লানিবোধ ছিল না। আধুনিক ভাবনা-চিন্তাই ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির মনে শাস্ত্র ও লোকাচার

সমর্থিত অন্যায় বিষয়ে বোধ জাগিয়ে তোলে এবং ফলে তাঁদের ভিতরে অনেকে সমাজ সংস্কারে উদ্যোগী হন।

তাছাড়া আর একটা ব্যাপারে তাঁরাও সচেতন হয়ে উঠছিলেন। ব্যক্তিকতা, অধিকারচেতনা, জ্ঞানচর্চায় এবং জীবনযাত্রায় যুক্তিশীলতার প্রতিষ্ঠা—এই সব আধুনিক ধ্যানধারণা সম্পর্কে অন্তঃপুরবাসিনী যদি অজ্ঞ এবং উদাসীন থাকেন অথবা পরম্পরা এবং লোকাচার বশবর্তী হয়ে এই সব ধ্যানধারণার প্রতি বিমুখ হন, তা হলে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত পুরুষের সংস্কার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবার সম্ভাবনা খুবই কম। তাঁদের উদ্যোগে নারীদের না যুক্ত করতে পারলে তাঁরা যেমন নিজের ঘরে পরবাসী হয়ে থাকবেন, অশিক্ষিত কুসংস্কারচ্ছন্ন মাতৃকুলের প্রভাবে তাঁদের সন্তানরাও পরম্পরাশ্রয়ী হবে, এবং তাঁদের নব্য ধ্যানধারণা উত্তরপুরুষে প্রবাহিত হয়ে বলিষ্ঠতা ও ব্যাপকতা অর্জন করবে না। সুতরাং আধুনিকতাপন্থী সংস্কারকদের কাছে নারীশিক্ষা খুব জরুরি ঠেকে। রামমোহন লিখেছিলেন, শরীরের দিক থেকে মেয়েরা পুরুষের মত বলশালী নয় ব'লে মেয়েদের বহু গুণ থাকা সত্ত্বেও পুরুষরা মেয়েদের যোগ্য পদ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। এই ব্যবস্থা যে অত্যন্ত অন্যায় সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল না। বিদ্যাশিক্ষার সুযোগের অভাবে নারীদের সহজাত গুণাবলী যে বিকশিত হয় না, এজন্য তিনি পুরুষদের দায়ি করেছিলেন। (প্রবর্তক-নির্বতক সম্বাদ, ১৮১৮)। রামমোহন, ডিরোজিওর চেলা ইয়ং বেঙ্গল এর সদস্যরা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, কেশবচন্দ্র সেন—এঁরা প্রত্যেকেই নারীদের উপর চাপানো অন্যায় বিধিনিষেধের দূরীকরণ, তাঁদের অবস্থার উন্নয়ন এবং তাঁদের ভিতরে আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তন এবং প্রসারের ব্যাপারে উদ্যোগী হন।

উনিশ শতকের শেষভাগে এ ক্ষেত্রে সবচাইতে উদ্যোগী ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্যরা। আপন আপন পরিবারে স্ত্রীলোকদের ঔদাসীন্য, অসহযোগ বা সুস্পষ্ট বিরূপতা রামমোহন দ্বারকানাথ, ঈশ্বরচন্দ্র প্রমুখকে যেভাবে পীড়িত করেছিল, তরুণ ব্রাহ্মরা নিজেদের চেষ্টায় আপন আপন গৃহে তা অনেকটা নিরসন করতে সক্ষম হন। এ দেশে মেরির প্রভাব পড়েনি, কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিশেষ প্রভাব পড়েছিল জন স্টুয়ার্ট মিলের। মিলের বিখ্যাত বই 'সাবজেকশান অব উম্যিন'-এর বাংলায় সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর; সত্যেন্দ্রনাথের সূত্রে নারীমুক্তির কিছু কিছু ধারণা প্রবাহিত হয় ঠাকুর পরিবারে।

শিক্ষিত বাঙালির মনে মিলের রচনাবলি আলোড়ন তুলেছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ভাবুক এবং চিন্তক বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য' পড়লে এটি স্পষ্ট বোঝা যায়। চাষীর দুরবস্থা নিয়ে বঙ্কিমের লেখার সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালি পাঠকমাত্রই পরিচিত, কিন্তু নারী সম্পর্কে তিনি যা লিখেছিলেন সে যুগের পক্ষে তা খুবই র‍্যাডিক্যাল। কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকা 'সাম্য' গ্রন্থের পঞ্চম পরিচ্ছেদে অবশ্যই পড়বেন। এখানে তা থেকে কয়েকটি উদ্ধার করা সঙ্গত মনে করি—

> 'আমাদের দেশে যে পরিমাণে স্ত্রীগণ পুরুষাধীন, ইউরোপে বা আমেরিকায় তাহার শতাংশ নহে।'' ''আমাদের দেশ অধীনতার দেশ, সর্বপ্রকার অধীনতা

হইতে বীজমন্ত্রে অঙ্কুরিত হইয়া উর্বরা ভূমি পাইয়া বিশেষ বৃদ্ধিলাভ করিয়া থাকে... এখানে স্ত্রী যেমন পুরুষের আজ্ঞানুবর্তিনী, অন্যত্র তত নহে...পুরুষকৃত ব্যবস্থাবলির উদ্দেশ্যই তাই; যত প্রকার বন্ধন আছে, সকল প্রকার বন্ধনে স্ত্রীগণের হস্তপদ বাঁধিয়া পুরুষপদমূলে স্থাপিত কর—পুরুষগণ স্বেচ্ছাক্রমে পদাঘাত করুক। অধম নারীগণ বাঙনিষ্পত্তি করিতে না পারে...তুমি বিধানকর্তা পুরুষ, তোমার সুতরাং পোয়া বারো। তোমার বাহুবল আছে, সুতরাং তুমি এ দৌরাত্ম্য করিতে পার। কিন্তু জানিয়া রাখ যে, এ অতিশয় অন্যায় গুরুতর এবং ধর্মবিরুদ্ধ অসাম্য।...স্ত্রীগণ বুদ্ধি স্থৈর্য, চতুরতায় পুরুষাপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে।...স্ত্রী গণ সুশিক্ষিতা হইলে তাহারা অনায়াসেই গৃহমধ্যে গুপ্ত থাকার পদ্ধতি অতিক্রম করিতে পারিবে। শিক্ষা থাকিলেই অর্থোপার্জনে নারীগণের ক্ষমতা জন্মিবে।'

পরবর্তী কালে বঙ্কিমের চিন্তার লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন ঘটে—কিন্তু তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসে পুরুষদের তুলনায় নারীরাই বেশি প্রাণবন্ত ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। সম্ভবত মিলের অভিঘাতেই প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র স্ত্রী জাতির উপরে পুরুষের দৌরাত্ম্যের এত তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ করেছিলেন। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র আরো গভীরে নিবিষ্ট হয়ে অনুভব করেন সমাজে পরিবারে পুরুষ প্রাধান্য সত্ত্বেও, নারীর ভিতরে কী দুর্মর প্রাণশক্তি ও বিকাশ সম্ভাবনা বিদ্যমান। আয়েষা, কপালকুন্ডলা, পদ্মাবতী-লুফৎউন্নিসা, মৃণালিনী, প্রফুল্ল-দেবী চৌধুরাণী, শান্তি নির্মলকুমারী—আশ্চর্য এই সব আত্মশক্তিসম্পন্না অঙ্গনাদের পাশে জগৎসিংহ, ওসমান, নবকুমার, ব্রজেশ্বর, জীবনান্দ, ভবানন্দ এমনকি রাজসিংহ ও মানিকচাঁদকেও অনেকটা কাঠের পুতুলের মত ঠেকে। বস্তুত আমার মনে হয় নারীকে আবিষ্কারের উদ্দীপকই বাংলা কথা সাহিত্যকে কৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্য এবং পাঁচালীর জগৎ থেকে উপন্যাসে উত্তরণ ঘটায়। সমাজ হয়তো বিশেষ বদলায়নি, কিন্তু সাহিত্যে আধুনিকতা উনিশ শতকে ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে।

তিন.

নারীদের অবস্থান উন্নয়ন এবং তাঁদের ভিতরে শিক্ষার প্রসার ঘটানোর উদ্দেশ্যে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যেসব পত্রিকা প্রকাশ হয়, 'বামাবোধিনী' নিঃসন্দেহে তাদের ভিতরে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য। আধুনিক ধ্যানধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নারীদের উন্নয়নে এবং শিক্ষায় বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন ডিরোজিও-শিষ্য ইয়ং বেঙ্গলদের অনেকে, পরে অক্ষয়কুমার দত্তের লেখার দ্বারা প্রভাবিত তরুণ ব্রাহ্মদের সকলে। হিন্দু ফিমেল স্কুল (পরে বেথুন স্কুল) এর জন্য জমি এবং টাকা দেন ডিরোজিও শিষ্য দক্ষিণারঞ্জন; স্ত্রী শিক্ষার জন্য বাংলা ভাষায় প্রথম যে পত্রিকা বেরোয় সেই 'মাসিক পত্রিকা'র দুই প্রতিষ্ঠাতা—রাধানাথ সিকদার এবং প্যারীচাঁদ মিত্র—দুজনেই ডিরোজিওর ছাত্র। অন্যদিকে অক্ষয়কুমারের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী 'অবলাবান্ধব' পত্রিকা বার করেন; বন্ধু দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসুর সঙ্গে

মিলিত হয়ে বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন; ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং প্রগতিতেও তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। তিনি নিজে এন্ট্রান্স পাস করেননি; কিন্তু তাঁর উদ্যোগে এবং সমর্থনে স্ত্রী কাদম্বরী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্র্যাজুয়েট হবার পর প্রথমে কলকাতায় পরে এডিনবরা এবং গ্লাসগোতে চিকিৎসাবিদ্যায় শিক্ষা নিয়ে উপাধি অর্জন করেন। খুব সীমাবদ্ধ স্তরে এবং ধীর গতিতে হলেও উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আধুনিক চিন্তা বাঙালি মেয়েদের মনে প্রবেশ করেছিল। এই প্রবেশের ইতিবৃত্ত রচনা করবার জন্য যেসব উৎসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অপরিহার্য 'বামাবোধিনী' পত্রিকা তাদের মধ্যে প্রধান।

'বামাবোধিনী' প্রথম সংখ্যা বেরোয় ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে (ভাদ্র,'১২৭০ বঙ্গাব্দ); বন্ধ হয়ে যায় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে (১৩৯২ বঙ্গাব্দ)। ষাট বছর ধরে একটি পত্রিকার প্রকাশ যে-কোনও যুগেই অসামান্য একনিষ্ঠা, অধ্যবসায় এবং কর্মদক্ষতার পরিচায়ক। 'বামাবোধিনী' ব্যবসায়িক পত্রিকা ছিল না। এটির উদ্দেশ্য ছিল 'অন্তঃপুরমধ্যে বিদ্যালোকে প্রবেশের পথ নির্মাণ করা। যাতে এটি সাধারণ সকলের, বিশেষ করে বামাদের গ্রহণসাধ্য হতে পারে এজন্য এর প্রতি সংখ্যার মূল্য ধার্য করা হয় এক আনা। প্রথম সংখ্যায় উপক্রমণিকায় জানানো হয় যে, 'এই পত্রিকাতে স্ত্রীলোকদিগের আবশ্যকীয় সমুদায় বিষয় লিখিত হইবে। তন্মধ্যে যাহাতে তাহাদের ভ্রম ও কুসংস্কার সকল দূর হইয়া প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়; যাহাতে তাহাদের উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি সকল উপযুক্ত বিষয়ে পরিচালিত হয়, এবং যাহাতে তাহাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় সকল জ্ঞান লাভ হইতে পারে—তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে।' আশ্বিন সংখ্যায় আলোচনা করে বোঝানো হয় যে, 'জ্ঞানলাভেই বিদ্যালয়ে মনের শক্তিসকল যত প্রকাশ পাইবে এবং নানা বিষয়ের জ্ঞান যত বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, ততই বিদ্যার বৃদ্ধি হইবে। বিদ্যার সংখ্যা নাই, বিদ্যার কেহ সীমাও করিতে পারে না। সকল বিদ্যাতেই পৃথক পৃথক জ্ঞান ও পৃথক পৃথক সুখ।' তারপর যেসব বিদ্যার চর্চা দরকার তাদের উদাহরণ হিসেবে উল্লিখিত ও ব্যাখ্যাত হয় ভূগোল ও ভূতত্ত্ব বিদ্যা খগোল বিদ্যা, ইতিহাস প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত এবং জীবনচরিত।

সম্পাদক মনে করেন, 'ঈশ্বর কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলকে আত্মোন্নতি সাধন করিবার সমান ক্ষমতা ও সমান অধিকার প্রদান করিয়াছেন। পুরুষের যে প্রকার বিদ্যাভাস এবং আত্মোন্নতি সাধন করিবেন, স্ত্রীলোকদিগেরও সেই প্রকার বিদ্যাভাস ও আত্মোন্নতি সাধন করা কর্তব্য।' (পৌষ ১২৭১)। অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার জন্য 'বামাবোধিনী' পাঁচ বছরের একটি পাঠক্রম, পাঠ্যপুস্তকের তালিকা এবং পরীক্ষার ব্যবস্থা করে। যাঁরা মনে করেন প্রস্তাবিত পাঠসূচি কঠিন এবং বিষয়গুলি স্ত্রীলোকেদের কাজে লাগবে না তাঁদের অভিযোগের উত্তরে সম্পাদক জানান, ' কোন বিদ্যা কঠিন বলিয়া অনাবশ্যক পরিতাজ্য নয়। বিশেষত এখানকার ভূগোল, ব্যাকরণ, গণিত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক।

তবে এ কথা বললেও স্ত্রী এবং পুরুষদের একই ধরনের শিক্ষা হওয়া কাম্য কিনা তা নিয়ে যে প্রবল মতভেদ ছিল, এবং 'বামাবোধিনী'র সম্পাদক ও লেখক-লেখিকারাও যে যথেষ্ট দ্বিধান্বিত ছিলেন,পত্রিকার পৃষ্ঠায় বারেবারেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। মেয়েদের মধ্যে

আধুনিক শিক্ষার প্রসার যখন লক্ষণীয়ভাবে ঘটছে তখনও আমরা পড়ি, 'স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে নানাজনের নানাপ্রকার মত।...কেহ কেহ বলেন, স্ত্রী এবং পুরুষের শিক্ষা একই রকম হওয়া কখনই যুক্তিসিদ্ধ নয়। পুরুষের এবং নারীর প্রকৃতি এবং শারীরিক গঠন যখন ভিন্ন, উভয়ের শিক্ষাও ভিন্নরূপ হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। কোমলপ্রকৃতি নারীদিগকে কঠোরপ্রকৃতি পুরুষের সমকক্ষ করিয়া একই রূপ শিক্ষা দিলে সমাজ ও সংসারে মহা অকল্যাণ ঘটিবে।' অপর পক্ষের মতে 'স্ত্রী এবং পুরুষের শিক্ষা একই রূপে হওয়া উচিত। কারণ স্ত্রী এবং পুরুষের শিক্ষা একরূপ না হইলে, পুরুষ এবং নারীর চিন্তা, কার্য ও শক্তি কখনই একত্র মিলিত হইয়া দেশ ও সমাজের সেবা করিতে পারে না। জগতের উন্নতিতে সহায়তা করিতে পারে না।' এছাড়া তৃতীয় একটি প্রতিন্যাসেরও আভাস মেলে। এটি অনুসারে 'পুরুষের ন্যায় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলে' নারী, আগেও যেমন ঐ শিক্ষা লাভের পরও তেমনই, 'পুরুষের ক্রীড়ার পুত্তলিকা এবং সুখস্বার্থসিদ্ধির যন্ত্ররূপেই ব্যবহৃত হবে।' ' সৌন্দর্য ও শান্তির রসাস্বাদন করিবার শক্তি পুরুষ অপেক্ষা নারীরই প্রবল এবং গুণ ও গুণীর আদরের স্থান নারীর হৃদয়েই সমধিক।...নারীর জ্ঞানপিপাসা যাহাতে ক্ষুদ্র পুঁথির মধ্য হইতে জগতের কার্যে, শিল্পে বিজ্ঞানে সকলের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া চরিতার্থ হইতে পারে, নারীর কার্যক্ষেত্র নিজ গৃহ পরিবারের সীমা অতিক্রম করিয়া যাহাতে বিশ্বময় পরিব্যপ্ত হইতে পারে...চিন্তায় ও কার্যে যাহাতে মহিমাময়ী হইয়া সে নিজের গন্তব্য পথ, নিজের স্থান নিজেই নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়, এইরূপ স্বাধীনতার পথই তাহাদের নিকট খুলিয়া দিতে হইবে, এমনই জ্ঞানালোক তাহাদের অন্তরে প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে হইবে।' ১৩২৭ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত 'স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা' নামে এই প্রবন্ধের লেখিকার নাম শ্রীমতী। প্রথম নাম বা বংশনাম নেই, কিন্তু বাঙালি মধ্যবিত্ত হিন্দুর অচলায়তনে আধুনিক চিন্তার মুক্ত হাওয়া প্রবেশ করেছে বোঝা যায়।

তবে 'বামাবোধিনী'র সম্পাদক, পরিচালকগোষ্ঠী এবং অধিকাংশ লেখক-লেখিকা ছিলেন মধ্যপথগামী, তাঁরা র‍্যাডিক্যালপন্থী ছিলেন না। মেয়েদের আধুনিক শিক্ষা দেওয়া দরকার, প্রয়োজনমত উচ্চশিক্ষাও, তাঁরাও স্বাগত করেন, তবে পরিবারের ধর্মরক্ষা, গৃহকর্মে নিপুণতা, পতিপুত্রের প্রতি দায়িত্বপালন এসবের জন্য মেয়েদের বিশেষ শিক্ষাও তাদের বিচারে আবশ্যিক। যে মেয়েরা কৃতিত্বের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তাঁদের তাঁরা অকুণ্ঠিত প্রশংসা করেছেন, কিন্তু এ কথাও তাঁরা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, 'বিদ্যানুশীলনে যেমন অসীম আনন্দ লাভ করা যায়' তেমনই সন্তানপালন এবং গৃহকার্য সম্পাদনের' সামর্থ্যও বৃদ্ধি পায়। এই ধরনের প্রতিন্যাসে পশ্চিমেও প্রবল ধাক্কা লাগতে শুরু করে বিশ শতকের তৃতীয় পাদে, এ দেশে তার ঢেউ পৌঁছয় এই শতকের আশির দশকে।

'বামাবোধিনী' যখন বন্ধ হয়ে যায়, আমি তখন নিতান্ত শিশু। কিন্তু আমার মা এবং বড় দিদি ঐ পত্রিকার গ্রাহিকা ছিলেন (হয়তো বা কালেভদ্রে তাঁদের রচনা প্রকাশিত হয়েও থাকতে পারে), ফলে কিশোর বয়সেই আমি ঐ পত্রিকার বাঁধানো কিছু খণ্ড পড়বার সুযোগ পাই। অনেক বছর পরে, তখন আমি মেলবোর্নে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, আমার অনুজপ্রতিম

গবেষক সহকর্মী গোলাম মুর্শিদ এবং আমার ছাত্রী মেরেডিথ বর্থউইকের বঙ্গদেশীয় নারী বিষয়ক গবেষণার প্রয়োজনে বামাবোধিনী পত্রিকার পূর্ণাঙ্গ সেটের মাইক্রোফিলিম আনানো হয়, এবং সেই সুযোগে ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত অনেক লেখাই পড়ি। মুর্শিদের গবেষণার ফল প্রকাশিত হয় ১৯৮৩ সালে *Reluctant Debutante : Response of Bengali Women of Medernization 1849-1905* নামে। পরের বছর প্রিন্সটন থেকে প্রকাশিত হয় মেরেডিথের গবেষণাগ্রন্থ : *The Changing Role of Women in Bengal.*

'বামাবোধিনী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪০-১৯০৭) ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন ১৮৫৯ সালে; হরিনাভি বিদ্যালয়ে কিছুকাল প্রধান শিক্ষক হিসেবে কাজ করবার পর তিনি ১৮৭৯ সালে সিটি স্কুল শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন; ১৮৮১ সালে সিটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে তার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঐ পদে কাজ করেন। বিখ্যাত ব্রাহ্ম নেতা আনন্দমোহন বসুর আমন্ত্রণে আমার পিতা পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ শাস্ত্রী সিটি কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন ১৮৯৮ সালে। উমেশচন্দ্রের সঙ্গে সেই সূত্রে আমাদের পরিবারের কিছুটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। নারীশিক্ষা প্রসার ছিল উমেশচন্দ্রের জীবনের একটি প্রধান ব্রত; 'নারীশিক্ষা' নামে তিনি নিজে একটি বই লেখেন। 'বামাবোধিনী' পত্রিকা তাঁর একটি প্রধান কীর্তি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উইমিন্স স্ট্যাডিজ রিসার্চ সেন্টারের পরিচালক এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) ভারতী রায়ের সম্পদনায় 'বামাবোধিনী' পত্রিকার নারীশিক্ষা সংক্রান্ত রচনাবলির একটি নির্বাচিত সংকলন সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্গদেশে নারীশিক্ষা সম্পর্কে গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং এই শতকের প্রথম দুই দশকে কী প্রকৃতির চিন্তা এবং চেষ্টা হয়েছিল সে বিষয়ে অনেকখানি নির্ভরযোগ্য পরিচয় এই সংকলন থেকে মিলবে। সম্পাদিকা ঠিকই বলেছেন, স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে মোটামুটি তিন ধরনের রচনা 'বামাবোধিনী'তে প্রকাশিত হত—'স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং প্রসারের পক্ষে ওকালতি, স্ত্রী শিক্ষার উপযোগী পাঠ্যবস্তু নিয়ে আলোচনা এবং স্ত্রী শিক্ষার অগ্রগতি বিষয়ে বিবরণ।' মেয়েদের নিজেদের রচনা প্রকাশ করায় 'বামাবোধিনী'র গোড়া থেকেই বিশেষ উৎসাহ ছিল; স্ত্রী শিক্ষা এবং নারীদের অবস্থার উন্নতি বিষয়ে পাঠিকাদের লেখা শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য পুরস্কার দেওয়া হত; পরীক্ষক ছিলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, প্যারীচরণ মিত্র এবং কেশবচন্দ্র সেন। 'বামাবোধিনী'তে নারী রচিত প্রথম রচনাটির লেখিকা 'শ্রীমতী তাহেরণ নেছা' বোদা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী (ফাল্গুন, ১২৭১); তারপর বৈশাখ ১২৭২-এ প্রকাশিত হয় শ্রীমতী সৌদামিনী দেব্যার রচনা। আলোচ্য সংকলনের যেটি শেষ লেখা (অগ্রহায়ণ, ১৩২৯) সেটিতে শ্রীচারুশীলা মিত্র প্রস্তাব করেছেন, যে, নারীদের এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে 'যাহাতে আবশ্যক হইলে তাহারা আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শিক্ষয়িত্রীর কার্য করিয়া নিজেদের জীবিকা অর্জনের উপায় নিজেরাই করিতে পারে।' সত্তরের দশক থেকেই মেয়েরা শুধু সাময়িকপত্রে নয়, গ্রন্থকারেও নিজেদের বক্তব্য প্রকাশ করতে থাকেন। সামাজিক বিজ্ঞান সভায় কেশবচন্দ্রের বক্তৃতায় নারী-

রচিত এগারোটি বইয়ের উল্লেখ আছে। (১৮৭০)। কৈলাসবাসিনী দেবী, ভূবনমোহিনী দাসী, মার্থা সৌদামিনী সিংহ, কৃষ্ণকুমারী দাসী প্রমুখ এগুলির লেখিকা।

চার.

ব্রাহ্মসমাজের নেতারা ছিলেন হিন্দু ধর্মের এবং হিন্দু সমাজের বিচক্ষণ সংস্কারক। মেরি ওয়লস্টোনক্র্যাফ্‌ট্ অথবা টমাস পেইনের মত তাঁরা আপোষহীন র‍্যাডিক্যাল ভাবুক ছিলেন না। বস্তুত উনিশ শতকের ভারতবর্ষে এমন ভাবুক-সাহিত্যিকের সন্ধান দুর্লভ, যিনি শুধু লোকাচার বা শাস্ত্রকে নয় সামাজিক অসাম্য এবং অন্যায়ের জন্য খোলাখুলিভাবে ধর্মকেই দায়ী করেছেন বা কোনো প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ধর্মের আদিগ্রন্থকে আক্রমণ করেছেন। তুহফাৎ-এর মুক্তবুদ্ধি অবশ্যই তারিফযোগ্য, কিন্তু রামমোহন ছিলেন একেশ্বরবিশ্বাসী হিন্দু। হৃদয়হীন, যুক্তিহীন লোকাচারই ছিল বিদ্যাসাগরের আক্রমণের নিশানা, কিন্তু কলিযুগে পরাশরের প্রাধিকার তিনি মেনেছিলেন। উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং বিশ শতকের গোড়ায় স্বাজাতিক রাজনীতি এবং আগ্রাসী হিন্দুদের যুগপৎ আক্রমণে ধর্মসংস্কার এবং সমাজসংস্কার প্রচেষ্টা দুই-ই ব্যাহত হয়, ব্রাহ্মদের আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে। এই পরিবেশে রোকেয়া খাতুন বা রোকেয়া হোসেনের আবির্ভাব আজও আমার মনে হয় এক ঐতিহাসিক মহাবিস্ময়কর ঘটনা।

পশ্চিমী আধুনিক ধ্যানধারণা শহরবাসী শিক্ষিত হিন্দুদের একটি উল্লেখ্য অংশের মনকে যে ভাবে উদ্দীপিত করেছিল অন্তত উনিশ শতকে শিক্ষিত মুসলমান মনে তার সঙ্গে তুলনীয় উদ্দীপনা ঘটায় নি। সৈয়দ আহমদ খান এবং সৈয়দ আমীর আলির উদ্যোগ এবং রচনাবলীর কথা আমরা জানি; তাঁরা বিজ্ঞান চর্চা এবং যুক্তিশীলতার প্রসার চেয়েছিলেন; কিন্তু খোলাখুলিভাবে ধর্মের সমালোচনা বা সমাজসংস্কারে তাঁদের বিশেষ ভূমিকা ছিল না। বন্ধু সালাহুদ্দিন আহ্‌মদ বঙ্গদেশের মুসলমানদের ভিতরে আধুনিক চিন্তার অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে দেলদেওয়ার হোসেনকে নিয়ে আলোচনা করেছেন; তাঁর নির্বাচিত রচনাবলী *(Selected Writings of Delwar Hossen Ahmed Meerza 1840-1913) : Dhaka, 1980)* কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। মিল, বাক্‌ল্ এবং হার্বার্ট স্পেনসারের ভাবনাচিন্তা দেলওয়ার হোসেন-কে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু তিনিও পশ্চিমী অর্থে র‍্যাডিক্যাল ছিলেন না, এবং শিক্ষিত মুসলমান সমাজে তাঁর উদারনৈতিক চিন্তার প্রভাব পড়ে নি। কয়েক বছর আগে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক ইরফান হাবীব আমার কাছে দুঃখ করে বলেছিলেন, ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে না দেখা দিয়েছে কোনো রামমোহন না কোনো বিদ্যাসাগর, তাদের মানসিক বিকাশ আজও তাই ব্যাহত। মার্ক্সপন্থী ঐতিহাসিকদের মুখে কথাটা একটু বেমানান ঠেকেছিল। অবশ্য রোকেয়া, নজরুল বা আবুল হোসেনের লেখা ইরফান হাবীব পড়েনি, বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে "বুদ্ধির মুক্তি" আন্দোলনের বিবরণও তাঁর জানা ছিল না।

কিন্তু রোকেয়া যে সময়ে কলম ধরেন সে সময়ে বঙ্গদেশে হিন্দু বা মুসলমান কোনো ভাবুক পথিকৃৎ-ই তাঁর জন্য পাঠকচিত্তকে প্রস্তুত করেছিলেন বলে জানা নেই। বস্তুত বাঙালি মুসলমানদের

রচিত এগারোটি বইয়ের উল্লেখ আছে। (১৮৭০)। কৈলাসবাসিনী দেবী, ভূবনমোহিনী দাসী, মার্থা সৌদামিনী সিংহ, কৃষ্ণকুমারী দাসী প্রমুখ এগুলির লেখিকা।

চার.

ব্রাহ্মসমাজের নেতারা ছিলেন হিন্দু ধর্মের এবং হিন্দু সমাজের বিচক্ষণ সংস্কারক। মেরি ওয়লস্টোনক্র্যাফ্ট্ অথবা টমাস পেইনের মত তাঁরা আপোষহীন র‍্যাডিক্যাল ভাবুক ছিলেন না। বস্তুত উনিশ শতকের ভারতবর্ষে এমন ভাবুক-সাহিত্যিকের সন্ধান দুর্লভ, যিনি শুধু লোকাচার বা শাস্ত্রকে নয় সামাজিক অসাম্য এবং অন্যায়ের জন্য খোলাখুলিভাবে ধর্মকেই দায়ী করেছেন বা কোনো প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ধর্মের আদিগ্রন্থকে আক্রমণ করেছেন। তুহফাৎ-এর মুক্তবুদ্ধি অবশ্যই তারিফযোগ্য, কিন্তু রামমোহন ছিলেন একেশ্বরবিশ্বাসী হিন্দু। হৃদয়হীন, যুক্তিহীন লোকাচারই ছিল বিদ্যাসাগরের আক্রমণের নিশানা, কিন্তু কলিযুগে পরাশরের প্রাধিকার তিনি মেনেছিলেন। উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং বিশ শতকের গোড়ায় স্বাজাতিক রাজনীতি এবং আগ্রাসী হিন্দুদের যুগপৎ আক্রমণে ধর্মসংস্কার এবং সমাজসংস্কার প্রচেষ্টা দুই-ই ব্যাহত হয়, ব্রাহ্মদের আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে। এই পরিবেশে রোকেয়া খাতুন বা রোকেয়া হোসেনের আবির্ভাব আজও আমার মনে হয় এক ঐতিহাসিক মহাবিস্ময়কর ঘটনা।

পশ্চিমী আধুনিক ধ্যানধারণা শহরবাসী শিক্ষিত হিন্দুদের একটি উল্লেখ্য অংশের মনকে যে ভাবে উদ্দীপিত করেছিল অন্তত উনিশ শতকে শিক্ষিত মুসলমান মনে তার সঙ্গে তুলনীয় উদ্দীপনা ঘটায় নি। সৈয়দ আহমদ খান এবং সৈয়দ আমীর আলির উদ্যোগ এবং রচনাবলীর কথা আমরা জানি; তাঁরা বিজ্ঞান চর্চা এবং যুক্তিশীলতার প্রসার চেয়েছিলেন; কিন্তু খোলাখুলিভাবে ধর্মের সমালোচনা বা সমাজসংস্কারে তাঁদের বিশেষ ভূমিকা ছিল না। বন্ধু সালাহুদ্দিন আহ্মদ বঙ্গদেশের মুসলমানদের ভিতরে আধুনিক চিন্তার অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে দেলদেওয়ার হোসেনকে নিয়ে আলোচনা করেছেন; তাঁর নির্বাচিত রচনাবলী *(Selected Writings of Delwar Hossen Ahmed Meerza 1840-1913) : Dhaka, 1980)* কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। মিল, বাক্‌ল্ এবং হার্বার্ট স্পেনসারের ভাবনাচিন্তা দেলওয়ার হোসেন-কে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু তিনিও পশ্চিমী অর্থে র‍্যাডিক্যাল ছিলেন না, এবং শিক্ষিত মুসলমান সমাজে তাঁর উদারনৈতিক চিন্তার প্রভাব পড়ে নি। কয়েক বছর আগে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক ইরফান হাবীব আমার কাছে দুঃখ করে বলেছিলেন, ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে না দেখা দিয়েছে কোনো রামমোহন না কোনো বিদ্যাসাগর, তাদের মানসিক বিকাশ আজও তাই ব্যাহত। মার্ক্সপন্থী ঐতিহাসিকদের মুখে কথাটা একটু বেমানান ঠেকেছিল। অবশ্য রোকেয়া, নজরুল বা আবুল হোসেনের লেখা ইরফান হাবীব পড়েনি, বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে "বুদ্ধির মুক্তি" আন্দোলনের বিবরণও তাঁর জানা ছিল না।

কিন্তু রোকেয়া যে সময়ে কলম ধরেন সে সময়ে বঙ্গদেশে হিন্দু বা মুসলমান কোনো ভাবুক পথিকৃৎ-ই তাঁর জন্য পাঠকচিত্তকে প্রস্তুত করেছিলেন বলে জানা নেই। বস্তুত বাঙালি মুসলমানদের

আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।...পুরাকালে যে ব্যক্তি প্রতিভাবলে দশজনের মধ্যে পরিচিত হইয়াছেন, তিনিই আপনাকে দেবতা কিম্বা ঈশ্বরপ্রেরিত দূত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

...তবেই দেখিতেছেন, এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষচিত বিধিব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ...যেখানে ধর্মের বন্ধন অতিশয় দৃঢ় সেইখানে নারীর প্রতি অত্যাচার অধিক।...যেখানে ধর্মবন্ধন শিথিল সেখানে রমণী প্রায় পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থায় আছেন।

নবনূর ২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা ভাদ্র ১৩১১, পৃঃ ২৯৬-২৯৮

লেখাই বাহুল্য রোকেয়ার এই বৈপ্লবিক ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ ওঠে, এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় মূল প্রবন্ধের কিছু কিছু অংশ বাদ দিতে হয়। তা সত্ত্বেও "মতিচূর প্রথম খণ্ড"(১৯০৫) পড়লে সন্দেহ থাকে না মেরির মতই রোকেয়া তাঁর দেশেকালে নারীমুক্তির বস্তুত আদিপ্রবক্তা। তাঁর পূর্বে কৃষ্ণভাবিনী দাস এ বিষয়ে লিখেছেন বটে কিন্তু রোকেয়ার চিন্তা আরো দূরস্পর্শী, তাঁর বক্তব্য অনেক বেশি স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণ। তিনি লিখেছেন, পুরুষশাসিত সমাজে নারী পুরুষের দাসীতে পর্যবসিত এবং এই দাসত্ব নারী যাতে বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয় তার জন্য সমাজকর্তারা নানা নীতিতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, প্রতিষ্ঠান প্রকরণ, আচার আচরণ উদ্ভাবনা করেছেন। মুসলমান সমাজে মেয়েদের ঘরে যেমন সূর্যালোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ তেমনি মনোকক্ষেও জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিতে পারে না।" নারীদের সমস্ত অলঙ্কার "দাসত্বের নিদর্শন বিশেষ", মেয়েদের "সৌন্দর্যবর্ধনের চেষ্টা" তাঁর বিচারে "মানসিক দুর্বলতা"। তাঁর "অবরোধবাসিনী" গ্রন্থে সাতচল্লিশটি অবরোধ সম্পর্কিত ঘটনার বিবরণ দিয়ে দেখিয়েছেন এদেশের মেয়েদের কী দুরবস্থা। রোকেয়া চেয়েছিলেন নারীনর সাম্য। "পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব।" রোকেয়া লিখেছেন, পুরুষরা "ভূস্বামী, গৃহস্বামী প্রভৃতি হইতে হইতে ক্রমে আমাদের স্বামী হইয়া উঠিলেন। আর আমরা ক্রমশঃ তাঁহাদের গৃহপালিত পশুপক্ষীর অন্তর্গত অথবা ক্রমে মূল্যবান সম্পত্তি বিশেষ হইয়া পড়িয়াছি।" এদেশে নারীত্বের আদর্শ হিসাবে ধরা হয় সতীসাধ্বী সীতাকে। রোকেয়া ইবসেনের "পুতুলের ঘর" নাটকটি পড়েছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন যে "পুতুলের সঙ্গে কোন বালকের যে সম্বন্ধ সীতার সঙ্গে রামের সম্বন্ধ প্রায় সেইরূপ।" রোকেয়া জানতেন আর্থিক স্বাধীনতা ছাড়া নারীদের স্বাধীনতা অলভ্য। নারীরা শিক্ষা পেলে স্বাধীন ব্যবসায়ে নামতে পারে, সরকারী চাকরি দাবি করতে পারে, অন্যথায় তারা "কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশ" করতে পারে। তাঁর "পদ্মরাগ" উপন্যাসের নায়িকা সিদ্দিকা বলেছে: বিবাহিত জীবনই নারী জন্মের চরম লক্ষ্য নহে; সংসারধর্মই জীবনের সারধর্ম নহে।" এবং সে শুধু মুখে এ কথা বলে নি, সে লতিফকে ত্যাগ করেছে, লতিফের উপরোধ সত্ত্বেও তার ঘরে ফিরে যায়নি। রোকেয়া *Sultana's Dream* কল্পকাহিনীতে এমন এক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিবরণ দিয়েছিলেন যেখানে নারীকূলই দেশের অধিপতি ও পরিচালক, এবং যেখানে "পুরুষজাতি গৃহাভ্যন্তরে অবরুদ্ধ থাকে।"

"স্ত্রীজাতির অবনতি" প্রকাশের দশ বছর পরে (শ্রাবন ১৩২১) প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের

"স্ত্রীর পত্র"। শরৎচন্দ্রের "নারীর মূল্য" অনিলা দেবীর ছদ্মনামে যমুনা পত্রিকায় বেরিয়েছিল ১৩২০তে, বই আকারে বেরোয় আরো প্রায় এক দশক পরে (১৯২৪), তারপরে "শেষ প্রশ্ন" ১৯৩১-এ। বাঙালী চেতনায় আধুনিকতা ও নারীমুক্তি আদর্শের প্রসারে এরা এক একটি পদক্ষেপ। মৃণাল পনেরো বছর ঘরসংসার করবার পর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে জানতে পেরেছিল চিরকাল " মেজোবউ" হয়ে থাকাই তার নিয়তি নয়। "আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে।" বারো বছর বয়সে সে এসেছিল গ্রাম থেকে শহরে শ্বশুরবাড়িতে, দেখেছিল সেখানে অন্দরমহলে "আলো মিটমিট করে জ্বলে; হাওয়া চোরের মতো প্রবেশ করে।" যেহেতু তার শুধু রূপ ছিল না, সহজাত বুদ্ধিও ছিল, এবং সে চেয়েছিল বুদ্ধিকে মেনে চলতে—"আমি যেটাকে ভালো বলে বুঝি আর কারও খাতিরে সেটাকে মন্দ বলে মেনে নেওয়া আমার কর্ম নয়"—সেহেতু সংসারের সঙ্গে তার সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। নিতান্ত নিরুপায় সদাসন্ত্রস্ত যে বালিকাটিকে সংসারের নিষ্ঠুরতা থেকে মৃণাল রক্ষা করতে চেষ্টা করেছিল সে যখন সংসারের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে কাপড়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করল, তখন মৃণালের মনে আর সংশয় রইলো না "সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয়টা কী।" চারদিকে প্রাচীর তোলা নিরানন্দের যে সংসার "অভ্যাসের অন্ধকারে" মৃণালের মনকে ঢেকে রেখেছিল, বিন্দুর মৃত্যু মৃণালকে তা থেকে মুক্ত করে দিল। নোরার মতোই মৃণাল বেরিয়ে এল বউ এর খোলশ খুলে ফেলে—"বাইরে এসে দেখি, আমার গৌরব রাখার আর জায়গা নেই।"

'নারীর মূল্য' যমুনা পত্রিকায় বৈশাখ-আষাঢ় এবং ভাদ্র-আশ্বিন (১৩২০) সংখ্যাগুলিতে ছাপা হয়। বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক এবং সমাজতাত্ত্বিকদের লেখা থেকে প্রভূত উদ্ধৃতি দিয়ে শরৎচন্দ্র সমাজে প্রতিষ্ঠিত নারীনর অসাম্যের হেতু দেখাতে চেয়েছিলেন। "নারীর মূল্য হ্রাস পাইলে সমাজে কি অমঙ্গল প্রবেশ করে, এবং নারীর উপরে পুরুষের কাল্পনিক অধিকারের মাত্রা বাড়াইয়া তুলিলে কি অনিষ্ট ঘটে—তাহা নিজের কথায় এবং পরের কথায় বলিবার চেষ্টা করিয়াছি।" কিন্তু এ লেখাটিকে বই আকারে "ছাপাইবার প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না।"; সুধীরচন্দ্র সরকার জোর করেই এটির প্রথম সংস্করণ বার করেন (চৈত্র, ১৩৩০)। এই প্রবন্ধেরই কিছু কিছু বক্তব্য অনেক বেশি স্পষ্ট এবং শানিত রূপে কমলের মুখ দিয়ে 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে ব্যক্ত হয়। এটি ধারাবাহিকভাবে ভারতবর্ষ পত্রিকায় শ্রাবন ১৩৩৪ থেকে বৈশাখ ১৩৩৮-এ বই আকারে ১৯৩১-এর মে মাসে।

' শেষ প্রশ্ন' উঁচু দরের উপন্যাস নয়, কিন্তু কমলের চিন্তায়, আচরণে এবং চরিত্রে শরৎচন্দ্র যে নারীত্বের নকসা এঁকেছিলেন তা নিঃসন্দেহে আধুনিক ও র‍্যাডিক্যাল। শাস্ত্র, লোকমত, পরম্পরাকে কমল গ্রাহ্য করে না; সতীত্বের কল্পনা তার কাছে প্রবঞ্চনামাত্র; সে নারীর পূর্ণ স্বাধীনতার এবং স্বনির্ভরতার সাধিকা। তার ভাষায়, "একদিন যাকে ভালবেসেছি, কোনদিন কোন কারণেই আর তার পরিবর্তন হবার জো নেই, মনের এই অচল-অনড় জড়ধর্ম সুস্থও নয়, সুন্দরও নয়।...কোন আদর্শই বহুকাল স্থায়ী হয়েছে বলেই তা নিত্যকাল স্থায়ী হয় না এবং

তার পরিবর্তনেও লজ্জা নেই।" সে "দাসখত লিখে কোনো বন্ধন" মেনে নিতে রাজি নয়; কোনো লোভে বা ভয়েই নিজের স্বাধীনতাকে খর্ব করতে পারে না। কমল "মিথ্যা চিন্তা, মিথ্যা অভিমান, মিথ্যা বাক্যের আশ্রয়" নেয় না; কোনো জাতের কোনো একটি বিশেষ ছাঁচে সে দেশের মানুষকে চিরদিন গড়ে তোলার আদর্শ তার কাছে অর্থহীন; বিশ্বের মানবজাতির একজন বলে পরিচয় দেওয়াতে সে গৌরব বোধ করে। "সংসার ত্যাগ ও বৈরাগ্য সাধনা নয়, পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য, সমস্ত সৌন্দর্য সমস্ত প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকাই তার আদর্শ। পুরুষের ভোগের বস্তু "যারা" কমল "তাদের জাত" নয়। তার দাবি, "নারীজীবনের সত্যাসত্য নির্দেশের ভার নারীর পরেই" থাক ; পুরুষ সেই বিচারের দায়িত্ব নেওয়ার ফলে "সংসার চিরদিন ন্যায় বিড়ম্বিত, নারী অসম্মানিত এবং পুরুষের চিত্ত সঙ্কীর্ণ কলুষিত হয়ে গেছে।" সে জানে মেয়েদের তথাকথিত "আত্মোৎসর্গ পূর্ণতা থেকে আসে না, আসে শূন্যতা থেকে। "মানুষকে নিঃশেষে শুষে নেবার দূরভিসন্ধি যাদের তারাই অপরকে নিঃশেষে দান করবার দুর্বুদ্ধি যোগায়।" নীলিমা বলেছিল, কমল "যেন ঠিক নদীর মাছ। জলে ভেজার না ভেজার প্রশ্নই ওঠে না।" কমল সেই সত্য স্বাধীনতা অর্জন করেছে যা কেউ কাউকে দিতে পারে না, যা আসে "নিজের পূর্ণতায়, আত্মার আপন বিস্তারে।" অধৃষ্য তার আত্মমর্যাদাবোধ; "পরের অনুগ্রহ থেকে মুক্তি পাবার বীজমন্ত্র" তার জীবনকে চালিত করেছে। "মেয়েমানুষ যে শুধুই মেয়েমানুষ", মানুষ নয়, পুরুষশাসিত পরম্পরা লালিত এই ধারণাটাকে সে পুরোপুরি খারিজ করে দিয়েছে। সে মনে করে "চাটু বাক্যের নানা অলঙ্কার মেয়েদের গায়ে জড়িয়ে দিয়ে যারা প্রচার করেছিল মাতৃত্বই নারীর চরম সার্থকতা সমস্ত নারী জাতিকে তারা বঞ্চনা করেছিল।" সে জানে "সংসারে অনেক ঘটনার মধ্যে বিবাহও একটা ঘটনা, তার বেশি নয়" ওটাকেই নারীর 'সর্বস্ব বলে' যেদিন মানা হয়েছে " সেই দিন থেকেই শুরু হয়েছে মেয়েদের জীবনে সবচেয়ে ট্র্যাজেডি।" সে আরো জানে ভারতবর্ষ ইহকালকে তুচ্ছ করেছিল বলে ইহকালও ভারতকে "আজ জগতের কাছে তুচ্ছ করে দিয়েছে।" কমল আপোষহীন র‍্যাডিক্যাল; এই কাহিনীতে যে স্ত্রী পুরুষদের মধ্যে তার অবস্থান তাদের তুলনায় সে যেন একশো বছর এগিয়ে আছে। কমল চরিত্রে দ্বিধা দ্বন্দ্ব এবং পরিবর্তনের অভাব উপন্যাস বিচারে বড় ত্রুটি বটে, কিন্তু বাঙালি চেতনায় নারীমুক্তি আদর্শের স্ফুরণে কমল চরিত্রের ঐতিহাসিক তাৎপর্য মোটেই কাম্য নয়। বন্দী বিশ্ববিপ্লবী মানবেন্দ্র রায় 'শেষ প্রশ্ন' পড়ে কানপুর জেল থেকে বার্লিনে তাঁর সহকর্মিনী এলেন গটশাখে তাই লিখতে পারেন:

"The central figure of the book (Sceshprasna) is a girl who is veriatable Dionysus. How she pulls down all gods, customs and traditions, sanctified through ages, and gives sound lessons to young India which piously follows Tagore and Gandhi" (*Letters from jail, Sept. 6, 1931)*

মানবেন্দ্র নিজেও কারাবাসকালে ভারতীয় সমাজে নারীদের দূরবস্থার তীক্ষ্ণ সমালোচনা করে একটি বই লেখেন। (১৯৩৬); এটির নাম *The Ideal of Indian Womanhood;*, "ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ" নামে কেতকী কুশারী ডাইসনকৃত এটির একটি বাংলা অনুবাদও

সাম্প্রতিককালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর এদেশে মেয়েদের অবস্থার কিছু কিছু ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর উন্নতি হয়েছে, কিন্তু ষাট বছরের আগে লেখা এই বইটি থেকে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি উদ্ধৃতি দিলেই বোঝা যাবে মানবেন্দ্রের সমালোচনা এবং মূল বক্তব্য আজো কালাতিক্রান্ত হয় নি।

The sex-impulse in human beings differs from that is animals in that it rises above the biological functions of reproduction and expresses itself in a variety of beautiful forms of creation...The institution of marriage (both in traditional and contemporary India) sanctions the commission of rape enmasse. Neither consent, nor love, on the part of women is a condition for the sexual satisfaction of a man, and this brutality is sanctioned not by law, but by religion. (In India) marriage is an indissoluable bond which deprives woman of all freedom,denies her the right to an individual existence. A wife is not a human being, for her there are duties to be performed, not voluntarily, but under an inflexible discipline...The Hindu marriage grants women no rights whatsoever. She is a field for the husband to cultivate...The modern woman demands economic rights, social emancipation and a single standards of sex relation...There is no sex-war. The demand is for equality in sex-relation in society...For the bulk of Indian Womanhood, the glorious ideal (of Indian Womanhood) stands naked as chattel - slavery...The modern woman does not want to create social choas. She has been thrown in the midst of one. She is only trying to get out of its. Let her not be handicapped by the loadstone of the fictitious ideal of Indian Womanhood, tied around her neck."

নেহেরুর উদ্যোগে স্বাধীন ভারতে হিন্দু নারীরা আইনত কিছু কিছু অধিকার লাভ করেছেন বটে, কিন্তু বাস্তবে সংখ্যালঘু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু নারীদের মধ্যে সচেতন অংশকে বাদ দিলে অধিকাংশ ভারতীয় স্ত্রীলোক এখনো পর্যন্ত পরম্পরাপুষ্ট অসাম্য এবং দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। প্রত্যহ সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ, বিভিন্ন মহিলাসংগঠনের প্রতিবেদনে এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে নিত্যই টের পাই মেরি ওয়লস্টোনক্র্যাফট্-অর ভিন্‌ডিকেশ্যন" আজও কতখানি প্রবলভাবে অন্তত দক্ষিণ এশিয়াতে প্রাসঙ্গিক। আইনে দেওয়া অধিকার আর বাস্তবে সে অধিকার অর্জন এবং তার প্রতিষ্ঠা—এই দুই এর মধ্যে মস্ত ফাঁক আছে। সে ফাঁক দূর করবার জন্য চাই সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিপ্লব, শিক্ষার ভিতর দিয়ে সাম্য এবং স্বাধীনতার আদর্শকে দেশের স্ত্রী-পুরুষের চেতনায় বিস্তারিত এবং দৃঢ়মূল করা। এদেশে এখনো পর্যন্ত বিভিন্ন কমিউনিস্ট-মার্ক্সিস্ট নামে পরিচিত দলগুলিতেও নেতৃত্বের পদে পুরুষদের নেতৃত্ব যে আজো প্রায় একচেটিয়া এটি কিছু আকস্মিক ব্যাপার মনে হয় না। নম্বুদ্রীপদ, জ্যোতি বসু, হরকিশেন সিং, ইন্দ্রজিৎ, সোমনাথ প্রভৃতি বৃদ্ধদের নাম প্রায়ই খবরের কাগজে দেখি; কিন্তু কবে এদেশে বিপ্লবী আন্দোলনের পুরোভাগে তাত্ত্বিক এবং নেত্রী হিসেবে দেখা দেবেন রোজা, লুমেক্সবার্গ, রুথ ফিশার, আলেকজান্ড্রা, কোলোনটাই-এর মতো নারীরা?

যে দেশে, যে যুগে, যে সমাজ সংস্কৃতির ভিতরে আমি জন্মেছি এবং শৈশব কৈশোর কাটিয়েছি সেখানে এ প্রত্যয় এক রকম স্বতঃসিদ্ধ বলেই গৃহীত হত যে নারীর স্থান অন্তপুরে; পিতা, স্বামী এবং পুত্রের সেবা পরিচর্যায় জীবন উৎসর্গ করাই নারী ধর্ম, সতীত্ব এবং মাতৃত্বের দ্বারাই নারীর মূল্য নিরুপিত, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে সাধনা এবং সার্থকতা অর্জন নারীর পক্ষে অসাধ্য এবং অনাকাঙ্খিত। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-ব্রাহ্মসমাজ-রোকেয়া-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের সমালোচনা ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও গড়পড়তা, এমন কি শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের মনে পরম্পরাপুষ্ট দৃঢ়মূল এই প্রত্যয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত বিশেষ শিথিল হয়নি। এখন এই ধারণাকে বড় একটা কেউ স্বতঃসিদ্ধ বলে প্রকাশ্যে বলে না বটে, কিন্তু মনের ভিতর থেকে এবং বাইরের আচরণে স্ত্রী ও পুরুষকে সমান মূল্য দেন এমন মানুষের সংখ্যা এখনও দেশে নিতান্তই অল্প।

বস্তুত ফরাসী বিপ্লবের সময়ে সাম্যের বাণী ঘোষিত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু পশ্চিমেও ব্যাপক ভাবে নারীমুক্তি আন্দোলন খুব সাম্প্রতিককালের ঘটনা। বিস্তর লড়াই-এর পরে ইংল্যাণ্ডে প্রথম মহাযুদ্ধের প্রায় অবসানে ১৯১৮ সালে ত্রিশোর্ধ রমণীরা ভোটের অধিকার অর্জন করেন; সেটি পুরুষদের সঙ্গে সমান করে একুশ বছর করা হয় আরো দশ বছর পরে। আমেরিকাতে মেয়েদের ভোটাধিকার আইনত স্বীকৃত হয় ১৯২০ সালে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইয়োরোপে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিস্তর পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত ফ্রান্স, জার্মানী বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্টের পদে কোনো নারী নির্বাচন সাধারণ নাগরিকদের কাছে প্রায় অকল্পনীয়। ফলত ভারতবর্ষের বাইরে বিশ বছর অধ্যাপনার কালেও বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছি পৃথিবীর কোন দেশেই এখনও পর্যন্ত নারী নরের সমান মূল্য সমাজে প্রকৃতভাবে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি।

তবে এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দুটি ব্যাপার ক্রমেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। একটি তথ্যগত, অন্যটি আদর্শগত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধাক্কায় অনেক প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, বাইরের বেশ কিছু বাধা অপসৃত হয়। পরীক্ষার অভাবে যেসব ধারণাকে স্বতঃপ্রমাণ বলে ধরা হত, বাস্তবে প্রমাণ দেবার সুযোগ ঘটায় তাদের ভিতর অনেকগুলিই মূঢ়বুদ্ধির পরিচায়ক বলে ধরা পড়ে। অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই প্রমাণিত হয় জীবনের এমন কোন ক্ষেত্রই নেই যেখানে নারীর সামর্থ্য এবং কৃতি-সম্ভাবনা নরের তুলনায় কম। নারী উঠেছেন মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ায়, গবেষণা করতে গিয়েছেন দক্ষিণ মেরুতে; অনেকগুলি দেশে প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্টপ্রধান হয়েছেন নারী; পেয়েছেন নোবেল পুরস্কার, স্মরণীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন কাব্য এবং উপন্যাস রচনায়, দর্শন-বিজ্ঞান-সমাজতত্ত্ব চর্চায়, সমাজ সেবার এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সংগঠক হিসেবে। তথ্যের হিসাবে আজ কোন সংশয়ের অবকাশ নেই যে সমান সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা থাকলে মেয়েরা কোন ক্ষেত্রেই পুরুষদের তুলনায় পিছিয়ে থাকবে না। আমার ছাত্রাবস্থায়

কলেজে, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগগুলিতে ছাত্রীর সংখ্যা ছিল অত্যন্ত অল্প। এই দরিদ্র এবং রক্ষণশীল দেশে এখনও অধিকাংশ স্ত্রীলোকই নিরক্ষর। তবু যাঁরা কমবেশি সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন তাঁদের ভিতরে অনেকে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতেই সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেননি, বিভিন্ন পেশায় এবং দায়িত্বশীল পদেও বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, জজ, অ্যাডভোকেট, গর্ভনর, অ্যামবাস্যাডর, অধ্যাপক, অধ্যক্ষ, সম্পাদক, জার্নালিস্ট, শিল্পী, সাহিত্যিক, গবেষক, বৈজ্ঞানিক—এমন কোন পেশা বা পদের কথা আজ ভাবা শক্ত যেখানে নারী অযোগ্য বলে প্রমাণিত।

এটি গেল তথ্যের দিক। আদর্শের দিক থেকে একথাও দ্রুত স্পষ্টতর হয়ে উঠছে যে আধুনিক সভ্যতার বিশ্বব্যাপী সমকালীন সংকট অতিক্রমের অন্যতম প্রধান শর্ত সমাজ জীবনে নারীকে নরের সমান মূল্যদান। আধুনিক সভ্যতা মানুষের আগ্রাসী বৃত্তিকে এবং পার্থক্যবোধকে প্রবল করে তুলেছে। ফলে শুধু যুদ্ধবিগ্রহ দাঙ্গা হাঙ্গামাই বাড়েনি, প্রকৃতি পরিবেশের সঙ্গে যে ভারসাম্য জীবনের অপরিহার্য শর্ত তাও দ্রুত ভেঙে পড়ছে। সাম্রাজ্য বিস্তার, যুদ্ধবিগ্রহ, দাঙ্গা, হাঙ্গামা, ধর্ষকাম এসবের ভিতরে আগ্রাসী বৃত্তির নগ্ন নাটকীয় রূপ দেখতে পাই। কিন্তু আরও গভীরে দৃষ্টি দিলে বোঝা যায় তাই আগ্রাসী বৃত্তি যা অপর স্ত্রীপুরুষকে, পশুপক্ষী, তরুলতা, বিশ্বপ্রকৃতিকে শুধুমাত্র নিজের ভোগের উপাদান এবং উপায় বলে বিবেচনা করে। পুরুষশাসিত সভ্যতা মানুষের আগ্রাসী প্রতিন্যাসকে সাফল্যের জন্য অপরিহার্য ভেবে তাকে প্রাধান্য দিয়ে এসেছে; আধুনিক শিল্পবিপ্লোবত্তর সভ্যতায় এই ঝোঁক প্রবলতর হয়ে উঠেছে। প্রকৃতি এবং অপর স্ত্রী পুরুষকে উপায় মাত্র ভাবার ফলে একদিকে অপ্রেমের রাজত্ব বিস্তৃত হয়েছে, সমাজ ও প্রকৃতি থেকে বিযুক্ত মানুষ পর্যবসিত হয়েছে 'নিঃসঙ্গ দলবদ্ধতা'য়। অন্যদিকে হৃদয়হীন, দায়িত্বহীন ভোগ এবং অপচয়ের প্রাবল্যে প্রকৃতির সম্পদ দ্রুত নিঃশেষিত হচ্ছে, পরিবেশ হয়ে উঠছে প্রাণের পরিপন্থী। এই বিশ্বব্যাপী সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য অবিলম্বে প্রয়োজন উপযোগী সমাজ-আদর্শ, সমাজ-সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রিক-আর্থিক ব্যবস্থার ব্যাপক এবং গভীর রূপান্তর। এই উপযোগী আদর্শ এবং ব্যবস্থার কেন্দ্রে আছে শুধু নারী ও নরের সাম্য প্রতিষ্ঠা নয়, সমাজ ও সভ্যতার নারীর বিশেষ ভূমিকা ও মূল্যের সম্যক্ স্বীকৃতি।

আমাদের শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নারীরা হাতে কলমে প্রমাণ দিয়েছেন যে পুরুষদের তুলনায় তাঁদের কিছুই অসাধ্য নয়। এই সত্যের স্বীকৃতি এবং প্রতিষ্ঠা সমকালীন সমাজ বিপ্লবের প্রথম করণীয়। সঙ্গে সঙ্গে এটিও হৃদয়ঙ্গম করা দরকার যে নারীদের এমন কিছু বিশেষ সামর্থ্য আছে যা পুরুষদের নেই এবং এই সামর্থ্যের ফলে এমন কতগুলি গুণ বা বৃত্তি সাধারণত নারীদের ভিতরে দেখা যায় বর্তমান সংকটের সমাধানের জন্য যেগুলির অনুশীলন স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের পক্ষেই সবিশেষ মূল্যবান। নারীরা গর্ভধারণ করেন, প্রায় দশ মাস শিশুকে নিজের দেহের ভিতরে রক্ষণ ও প্রবর্ধন করে তারপরও বেশ কিছুকাল তাদের লালন পালনের দায়দায়িত্ব বহন করেন। এ কারণে তাঁদের ভিতরে মমতা, সহনশীলতা, নিজের চাইতে অন্যের প্রয়োজনকে অধিকতর মূল্য দেবার প্রবণতা, সহানুভূতি এবং সেবা শুশ্রূষার বৃত্তি পুরুষদের

তুলনায় অনেক বেশি দৃঢ়মূল। বস্তুত পুরুষরা মেয়েদের এই গুণগুলির সুযোগ নিয়ে তাঁদের জীবনকে অন্তঃপুরের মধ্যে আবদ্ধ রেখে এসেছে। তার ফলে মেয়েদের বিকাশ ব্যাহত, পুরুষদের চরিত্রের অভিমুখ একপেশে, বিকৃত এবং সমাজ সভ্যতার ইতিহাসে ধর্ষকাম প্রাবল্য পেয়েছে। আদর্শ হিসেবে যা প্রয়োজন তা হল সমাজ সংস্কৃতিতে এবং নাগরিক জীবনে মেয়েদের সমান ভূমিকা দিয়ে এই গুণগুলির অনুশীলনকে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সর্বসাধারণের জীবনচর্যার অন্তর্ভুক্ত করা। ম্যাচিসমো (machismo) বা মর্দানি যেমন মনুষ্যত্বের বিকাশকে বিপথগামী করে, অন্তঃপুর বা শুধুমাত্র আপন পরিবার বা স্বজনের মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও চিত্তের প্রসার এবং প্রবর্ধন ঘটে না। মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ স্ফুটনের জন্যই দরকার সমাজ সংস্কৃতির সমস্ত ক্ষেত্রে নারীদের অবাধ অংশগ্রহণের ব্যবস্থা। অপরপক্ষে সেই একই উদ্দেশ্যে পুরুষরা যদি আপন আপন চরিত্রে এবং ব্যবহারে নারীদের বিশেষ গুণগুলির চর্চা এবং পারিবারিক জীবনে নারীদের সঙ্গে সমান দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাতে তাঁদের ব্যক্তিত্ব সমৃদ্ধতর হবে। এবং উভয়েরই জীবনের ধারায় এই পরিবর্তন ঘটলে মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে, মানুষ, এবং মানুষের মধ্যে সংঘাত কমে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

শতাব্দীর শেষপাদে আমরা মহাবিপ্লবের যুগে বাস করছি। পুরানো অনেকগুলি সাম্রাজ্য আমার যৌবনকালে অবলুপ্ত হয়, সম্প্রতি পূর্ব ইউরোপের সোভিয়েট সাম্রাজ্য লয়প্রাপ্ত হল। নব্বইয়ের দশকে বিস্তর পরিবর্তন ঘটবে সন্দেহ নেই। যাঁরা পুরানো জমানায় অভ্যস্ত তাঁদের পক্ষে হয়ত বিশ্বাস করা শক্ত আজ যা আদর্শ রূপে কল্পিত কাল তাই বাস্তব হয়ে উঠতে পারে। নারী-নরের সাম্য এবং নারীর বিশিষ্ট মূল্যের সমাজজীবনে সর্বব্যাপী এবং দৃঢ়মূল প্রতিষ্ঠা ঘটতে হয়ত কিছু সময় লাগবে, হয়ত আমার জীবদ্দশায় এদেশে তা দেখে যেতে পারব না। কিন্তু দীর্ঘকাল অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি এমন তরুণ তরুণীর সংখ্যা বাড়ছে যারা বলের সাধনার পরিবর্তে বন্ধুত্বের সাধনাকে, আত্ম প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে আত্মীয় স্বজনকে, জীবজন্তু তরুলতা প্রকৃতি পরিবেশকে ভোগের উপাদান ভাবার পরিবর্তে এক মহৎ বৃন্দগানের অংশভাগ রূপে অনুভব করাকে তাঁদের জীবনের উদ্দিষ্ট হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তাঁদের কাছে নারী-নরের সমান মূল্য প্রাত্যহিক জীবনচর্যার নিয়ামক। আমার বিশ্বাস এঁরাই নব্যসভ্যতার প্রচারহীন পথনির্মাতা। শতাব্দীর শেষ দশকে পৌঁছে এই যথার্থ আধুনিক তরুণী তরুণদের ভিতরে আমি আশার আলো দেখি।